ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

১

সাবলটার্ন স্টাডিজ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। প্রথম সাবলটার্ন স্টাডিজ সম্মিলন হয় ১৯৮৩-তে। এরপর বারো বছরের মধ্যে আটি খণ্ড *সাবলটার্ন স্টাডিজ* সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে ষষ্ঠ সাবলটার্ন স্টাডিজ সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১৯৯৮-এর জানুয়ারি মাসে লখনৌতে।

গত পনেরো বছরে সাবলটার্ন স্টাডিজ-এর লেখাপত্রকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চার মহল বেশ কিছুটা আলোড়িত হয়েছে। তার ঢেউ অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান, এমন কি ভাষা-সাহিত্য-শিল্পচর্চার এলাকাতেও গিয়ে পৌঁছেছে। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষ বা দক্ষিণ এশিয়ার সমাজ-ইতিহাস চর্চার গণ্ডি ছাড়িয়ে *সাবলটার্ন স্টাডিজ* নিয়ে আলোচনা এখন বিশ্বের প্রায় সমস্ত আঞ্চলিক ইতিহাসরচনার ক্ষেত্রেই শুনতে পাওয়া যায়। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঐতিহাসিক-সমাজবিজ্ঞানীরা অনেকে স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের নিজস্ব সাবলটার্ন স্টাডিজ গোষ্ঠী তৈরি করেছেন। *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর মূল লেখাগুলো সকলে পড়ে থাকুন আর না-ই থাকুন, বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই ইতিহাস-সমাজবিজ্ঞান চর্চার মহলে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' এখন খুবই পরিচিত একটি নাম।

প্রথম সংকলনটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিরূপ সমালোচনাই শোনা গিয়েছিল বেশি। ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে গবেষণার প্রধান কেন্দ্রগুলির কর্তাব্যক্তিরা—ভারতবর্ষে, ইংল্যান্ডে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে—এবং প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিকেরা অনেকেই *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর বিরোধিতায় মুখর হয়েছিলেন। বলে রাখা দরকার, *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং প্রথম সংকলনে যাঁদের লেখা ছাপা হয়েছিল, একমাত্র রণজিৎ গুহ ছাড়া অন্য সকলেই তখন নিতান্ত তরুণ এবং অপরিচিত লেখক। অনেকেরই প্রথম গবেষণার কাজ প্রকাশিত হয় *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এ। সেদিক দিয়ে দেখলে, বিরূপ হলেও যে-পরিমাণ সমালোচনা এই সংকলনটি উদ্রেক করতে পেরেছিল, তা খানিকটা বিস্ময়করই বলতে হয়। বোঝাই যাচ্ছিল, পাঠককে তুষ্ট করতে না পারলেও, তার অভ্যস্ত ধ্যানধারণাকে কোথাও একটা নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে *সাবলটার্ন স্টাডিজ*।

পর-পর তিন বছরে প্রথম তিনটি খণ্ড বেরিয়ে যায়। তার পাশাপাশি প্রকাশিত হয় 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' গোষ্ঠীর লেখকদের নিজস্ব গবেষণাগ্রন্থ—জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে-র *দি*

Scanned with CamScanner

অ্যাসেম্ভেন্সি অফ দি কংগ্রেস ইন উত্তর প্রদেশ (১৯৭৮), গৌতম ভদ্র-র *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ* (১৯৮১), ডেভিড হার্ডিম্যান-এর *পেজান্ট ন্যাশনালিস্টস্ অফ গুজরাট* (১৯৮১), শাহিদ আমিন-এর *সুগারকেন অ্যান্ড সুগার ইন গোরখপুর* (১৯৮৪), পার্থ চট্টোপাধ্যায়-এর *বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭: দি ল্যান্ড কোয়েশ্চেন* (১৯৮৪) এবং ডেভিড আর্নল্ড-এর *পুলিশ পাওয়ার অ্যান্ড কলোনিয়াল রুল* (১৯৮৬)। এই পর্যায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই রণজিৎ গুহ-র *এলিমেন্টারি আসপেক্টস অফ পেজান্ট ইনসার্জেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া* (১৯৮৩)। ভারতবর্ষের ইতিহাসের লেখক-পাঠকদের সামনে প্রথম যে দুটি বিষয় উপস্থিত করে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'—(১) ঔপনিবেশিক ভারতে উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের স্বাতন্ত্র্য এবং (২) কৃষক চৈতন্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য—সেই দুটি বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বিশদ এবং তথ্যপূর্ণ আলোচনা করা হয় রণজিৎ গুহ-র বইতে। প্রথম পর্যায়ের *সাবলটার্ন স্টাডিজ* নিয়ে প্রবল বিতর্কের ঝড় ওঠে এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে।

গৌতম ভদ্র-র বইটি বাদ দিলে এইসব লেখাপত্র সবই ছিল ইংরেজিতে। কিন্তু প্রথম খণ্ড *সাবলটার্ন স্টাডিজ* প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাংলা পত্রপত্রিকাতেও এই বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। ১৯৮২-তে রণজিৎ গুহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে বাংলায় দুটি বক্তৃতা করেন যা *এক্ষণ* পত্রিকায় 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' শিরোনামে ছাপা হয়।[১] হয়তো স্বাভাবিক কারণেই, বাংলা পত্রপত্রিকায় এ সময়কার বিতর্কে একটা প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল সাবলটার্ন স্টাডিজ-এর বিশ্লেষণপদ্ধতির সঙ্গে মার্কসীয় বিশ্লেষণপদ্ধতির সামঞ্জস্য অথবা অসঙ্গতি। ১৯৮৫-তে *এক্ষণ* পত্রিকায় 'নিম্নবর্গ' শব্দটির পারিভাষিক পরিচয় দিতে গিয়ে আমি এই প্রসঙ্গে খানিকটা বিশদ আলোচনা করি। প্রথম পর্যায়ের *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর তাত্ত্বিক অবস্থান সম্বন্ধে একটা ধারণা এই আলোচনা থেকে পাওয়া যাবে, তাই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি নীচে উদ্ধৃত করলাম।[২]

২

Subaltern (নিম্নবর্গ): ইংরেজি ভাষায় শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে। ক্যাপ্টেনের অধস্তন অফিসারদের 'সাবলটার্ন' বলা হয়। তবে শব্দটির সাধারণ অর্থ হল অধস্তন বা নিম্নস্থিত। আরিস্ততেলীয় ন্যায়শাস্ত্রে এর অর্থ এমন একটি প্রতিজ্ঞা যা অন্য কোনও প্রতিজ্ঞার অধীন, যা বিশিষ্ট, মূর্ত, সার্বিক নয়। সাধারণ অর্থে ইংরেজিতে এর সমার্থক শব্দ হল 'সাবর্ডিনেট'।

মার্কসীয় আলোচনায় এই শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায় ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশির (১৮৯১-১৯৩৭) বিখ্যাত *কারাগারের নোটবই*-তে। এই নোটবইতে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে কিছু জটিলতা আছে। এটি রচিত হয়েছিল ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে, গ্রামশি যখন মুসোলিনির কারাগারে বন্দি। সেন্সরের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানোর জন্য বহুক্ষেত্রে প্রচলিত মার্কসীয় পরিভাষা বর্জন করে অন্য শব্দ ব্যবহার করেন গ্রামশি। যেমন 'মার্কসবাদ' কথাটা তিনি কোথাও ব্যবহার করেননি, বলেছেন 'প্রাক্সিসের দর্শন'। মার্কসের নামও ব্যবহার করেননি, বলেছেন, 'প্রাক্সিসের

দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা'। কিন্তু উল্লেখযোগ্য, এই ধরনের প্রতিশব্দ উদ্ভাবন করার মধ্য দিয়ে প্রচলিত মার্কসীয় ধারণাগুলি সম্পর্কে গ্রামশির নিজস্ব চিন্তা, তাদের তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বোধ, প্রায় অনিবার্যভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। 'মার্কসবাদ'-এর প্রতিশব্দ খুঁজতে গিয়ে তিনি যখন বেছে নেন 'প্রাক্সিসের দর্শন', তখন মার্কসবাদের তত্ত্বজগতের বিশেষ একটা দিক বেশি প্রাধান্য পেয়ে যায় তাঁর লেখায়। পরিভাষায় প্রচলিত অর্থের সঙ্গে যুক্ত হয় নতুন ব্যঞ্জনা। কারাবাসের পর্যায়ের রচনাগুলি পড়ার সময় আমরা এই রূপকসমৃদ্ধ ভাষার জায়গায় প্রচলিত পরিভাষাগুলি বসিয়ে নিয়ে পড়তে পারি নিশ্চয়। কিন্তু তাতে গ্রামশির চিন্তার জটিলতা, তার অভিনবত্ব, বহুলাংশেই হারিয়ে যাবে।

সাবলটার্ন (ইতালীয়তে *সুবলতের্নো*) শব্দটি গ্রামশি ব্যবহার করেছেন অন্তত দুটি অর্থে। একটি অর্থে এটি সরাসরিভাবে 'প্রলেটারিয়াট'-এর প্রতিশব্দ। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় 'সাবলটার্ন শ্রেণী' হল শ্রমিকশ্রেণী। সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ ধরনের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী শোষিত ও শাসিত হয়। এই বিন্যাসে 'সাবলটার্ন' শ্রমিকশ্রেণী বিপরীত মেরুতে অবস্থিত 'হেগেমনিক' শ্রেণী অর্থাৎ পুঁজিমালিক, 'বুর্জোয়াসি'। শ্রমিকশ্রেণী/বুর্জোয়াশ্রেণী, এই বিশেষ অর্থে সাবলটার্ন/হেগেমনিক শ্রেণীর সামাজিক সম্পর্কের বিষয়ে গ্রামশির বিশ্লেষণ আধুনিক মার্কসবাদী আলোচনায় এক বিশিষ্ট অবদান। এই বিশ্লেষণে গ্রামশি গুরুত্ব দিয়েছেন সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটির উপর যার মাধ্যমে বুর্জোয়াশ্রেণী কেবল শাসনযন্ত্রে তার প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠা করে না, সৃষ্টি করে এক সার্বিক সামাজিক কর্তৃত্ব বা 'হেগেমনি'। কেবল রাষ্ট্রীয় শক্তিকে অবলম্বন করে এই সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের জগতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে 'হেগেমনিক' বুর্জোয়াশ্রেণী তার শাসনের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে 'সাবলটার্ন' শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে সামাজিক সম্মতিও আদায় করে নেয়। গ্রামশির বিশ্লেষণে তাই গুরুত্ব পায় রাষ্ট্রের সঙ্গে বৃহত্তর নাগরিক সমাজের সম্পর্ক, জাতি, জনগণ, বুর্জোয়াশ্রেণী ও অন্যান্য শাসকগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক, জাতীয় জীবনের একচ্ছত্র প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, বুর্জোয়াশ্রেণীর সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, ইত্যাদি প্রশ্ন।

কিন্তু আরও সাধারণ অর্থেও 'সাবলটার্ন' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে গ্রামশির লেখায়। কেবল পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় নয়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্বেও 'সাবলটার্ন' শ্রেণীর কথা বলেছেন গ্রামশি। স্পষ্টতই এখানে 'সাবলটার্ন-এর অর্থ শিল্পশ্রমিক শ্রেণী নয়। বরং যে-কোনও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ক্ষমতাবিন্যাসের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উঠছে এখানে। এই বিন্যাসকে গ্রামশি দেখেছেন একটি সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার মধ্যে, যার এক মেরুতে অবস্থিত প্রভুত্বের অধিকারী 'ডমিন্যান্ট' শ্রেণী, অপর মেরুতে যারা অধীন সেই 'সাবলটার্ন' শ্রেণী। বহুক্ষেত্রেই অবশ্য গ্রামশি বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, শাসন এই শব্দগুলিকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ফলে কর্তৃত্বের অধিকার, প্রভুত্বের অধিকার, শাসনের অধিকার, এই ধারণাগুলির মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে কি না, গ্রামশির আলোচনা থেকে তা বোঝা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

Scanned with CamScanner

শুধু তাই নয়, যে-কোনও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রভুত্ব/অধীনতার এই সম্পর্কের সাধারণ চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু মন্তব্য করা সত্ত্বেও গ্রামশি এমন কয়েকটি তাত্ত্বিক সমস্যার মধ্যে পড়েছেন যার নির্দিষ্ট সমাধান তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না। উৎপাদন-সম্পর্কের দিক দিয়ে বিচার করলে এই প্রভুত্ব/অধীনতা সম্পর্ক স্বভাবতই নানা প্রকারের উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে গ্রথিত থাকতে পারে। তবে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ইতালীয় সমাজে পুঁজিবাদী বিকাশের অসম্পূর্ণতার পটভূমিতে সামন্তশ্রেণীর প্রভুত্ব ও কৃষকশ্রেণীর অধীনতার চরিত্রই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে এসেছে গ্রামশির লেখায়। প্রভুত্ব/অধীনতা সম্পর্কের সাধারণ চরিত্রটির সন্ধান করেছেন তিনি প্রধানত সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রগুলিতে। দুটি মূল ঝোঁক কাজ করেছে তাঁর মধ্যে। একদিকে ইউরোপীয় মার্কসবাদের আদিপর্বে কৃষকের সংস্কৃতি, ধ্যানধারণা, আচার-আচারণ ও রাজনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে যে তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞার ভাব ছিল, তার বিরুদ্ধে গ্রামশি বলে গেছেন 'সাবলটার্ন' কৃষকদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন, ধর্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক ধ্যানধারণার বিশিষ্ট লক্ষণগুলির কথা এবং বিপ্লবী নেতৃত্ব তথা বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে এই লক্ষণগুলিকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা ও বোঝার প্রয়োজনের কথা। অথচ একই সঙ্গে তিনি ক্রমাগত জোর দিয়েছেন কৃষকশ্রেণীর চেতনার সীমাবদ্ধতার উপর। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রভুত্বের অধিকারী যে শ্রেণী, তার চেতনার সমগ্রতা, মৌলিকতা, সক্রিয় ইতিহাসবোধের তুলনায় কৃষকচেতনা একান্তভাবেই খণ্ডিত, নির্জীব, পরাধীন। এমন কি বিদ্রোহের মুহূর্তেও তার চেতনা বহুলাংশেই আচ্ছন্ন থাকে শাসকশ্রেণীর মতাদর্শের আবরণে। কৃষকের ইতিহাসবোধ, ধর্মবিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতির যে বিবরণ গ্রামশির লেখায় পাওয়া যায় তা থেকে এটা মনে হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয় যে বৈপ্লবিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মতে কৃষকচেতনার মূল চরিত্র মোটামুটিভাবে নেতিবাচক।

তা হলে গ্রামশি এত জোরের সঙ্গে কৃষকের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও ভাবাদর্শের জগতটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন কেন? খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, ঘটনাটা অত সরল নয়। গ্রামশি কৃষকচেতনার সীমাবদ্ধতা এবং পরনির্ভরতার কথা বলেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু একই সঙ্গে এ-কথাও বলেছেন যে যে-কোনও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রভুত্ব/অধীনতা সম্পর্কটা হল বিরোধিতার সম্পর্ক। ফলে তার পরনির্ভরতার মধ্যেও কৃষকচেতনা সামন্তশ্রেণীর চেতনার বিপরীত বিন্দুতে অবস্থিত থাকে। এই বিরুদ্ধতার জন্য কৃষকচেতনার বাস্তব প্রকাশ সময় সময় ইতিবাচক ভূমিকাও গ্রহণ করতে পারে। লোকমানসের কিছু কিছু উপাদান যেমন আশ্চর্য রকমের শক্তিশালী—বিশেষ করে এক ধরনের স্বাভাবিক নীতিবোধ কাজ করে তার মধ্যে যা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, ন্যায়শাস্ত্র বা আইনের তুলনায় অনেক সহজ অথচ গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী। দৈনিক জীবনযাত্রার রীতিতে নানা পরিবর্তন ঘটলেও এই স্বাভাবিক ন্যায়-অন্যায় বোধ অক্ষুণ্ণ থাকে। এমন কি নতুন নতুন পরিস্থিতিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নানা অভিনব পন্থার জন্ম দিতেও তা সক্ষম। সংস্কৃতি বা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে লোকসংস্কৃতি যদিও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের চাপে ভারাক্রান্ত থাকে, তা সত্ত্বেও

'সাবলটার্ন' শ্রেণীগুলি তাদের নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সেই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদানকেই মাত্র বেছে নেয়, সমগ্রটা নেয় না। ফলে ধর্মীয় জীবনের সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক চেহারার মধ্যেও এক ধরনের স্তরবিন্যাস দেখা দেয়। শাসকশ্রেণীর ধর্মবিশ্বাস আর তাদের অধীন শ্রেণীগুলির ধর্মবিশ্বাস প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে এক হলেও তাদের আকার ও চরিত্র পৃথক, এমন কী বিরোধী রূপও ধারণ করতে পারে। এই বিরুদ্ধতা থেকেই জন্ম নেয় 'সাবলটার্ন' শ্রেণীর প্রতিরোধ, যা সময়সময়ই ক্ষমতাশালী শ্রেণীগুলিকে বিপদে ফেলতে সক্ষম হয়।

সুতরাং 'সাবলটার্ন' চেতনার সীমাবদ্ধতার কথাই যদিও গ্রামশির লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে, তা সত্ত্বেও এই চেতনার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির সম্ভাবনার ইঙ্গিতও তাতে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। মার্কসীয় তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে এই ইঙ্গিতগুলোর সঠিক তাৎপর্য কী, তার উত্তর কিন্তু গ্রামশির আলোচনায় খুব স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে না। এমন কি এই সম্ভাবনাগুলোকে তাত্ত্বিক সমস্যা হিসেবেও গ্রামশি নির্দিষ্টভাবে উপস্থিত করতে পারেননি।

সম্প্রতিকালে ভারতবর্ষের সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে 'সাবলটার্ন' শ্রেণীর ধারণাটিকে নতুনভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। রণজিৎ গুহ এর বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন 'নিম্নবর্গ'। *সাবলটার্ন স্টাডিজ* নামক প্রবন্ধসংকলনগুলিতে এবং জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, ডেভিড হার্ডিম্যান, রণজিৎ গুহ, শাহিদ আমিন প্রমুখ ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে এই ধারণাটি ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রামশির ইঙ্গিতগুলিকে অনুসরণ করেই 'নিম্নবর্গ' ধারণাটির উদ্ভব। কিন্তু তার প্রয়োগ ও বিস্তার করা হয়েছে ভারতবর্ষের সমাজ-ইতিহাসের ক্ষেত্রে। এর ফলে মার্কসীয় তত্ত্ব ও বিশ্লেষণপদ্ধতিতেও কয়েকটি নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। সেই সঙ্গে আবার দেখা দিয়েছে কিছু নতুন সমস্যাও।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে যাকে 'আধুনিক' পর্ব বলে অভিহিত করা হয়, মার্কসীয় পদ্ধতি অনুযায়ী তার মূল চরিত্রটির অনুসন্ধান করা প্রয়োজন প্রাক্‌ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে। ইউরোপের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের উদ্ভব সম্পর্কে কিছু ধারণা মার্কসবাদী আলোচনায় প্রচলিত আছে। সামন্তশ্রেণীর আধিপত্য ও কৃষকের অধীনতাকে কেন্দ্র করে যে উৎপাদনব্যবস্থা, তার ভঙ্গুর অবস্থা; পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদনের সূত্রপাত; কৃষকদের মধ্যে পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া; জমি ও উৎপাদনের উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন এক সর্বহারা শ্রেণীর সৃষ্টি, একই সঙ্গে শহরাঞ্চলে পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় শিল্পোৎপাদনের প্রসার—মোটামুটি এইভাবেই সামাজিক উৎপাদনের সামগ্রিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের উদ্ভবকে দেখা হয়ে এসেছে। এরই সমান্তরাল প্রক্রিয়া হিসেবে যুক্ত হয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর সামাজিক কর্তৃত্ব বিস্তার—ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও যুক্তিবাদী সমাজদর্শন, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক আদর্শ, প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা ইত্যাদি। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার যে প্রতিকল্পটি মার্কসীয় তত্ত্বে নির্মিত হয়েছিল, বলা বাহুল্য তার অবলম্বন ছিল পশ্চিম ইউরোপের অভিজ্ঞতা। উৎপাদন সম্পর্ক, রাষ্ট্রক্ষমতার বিন্যাস, সাংস্কৃতিক জীবন—প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য বিস্তারের একটা সঙ্গতিপূর্ণ চেহারা তুলে

Scanned with CamScanner

ধরা হয়েছিল এই প্রতিকল্পে। অর্থাৎ তত্ত্বের দিক দিয়ে এটাই ছিল বিশুদ্ধ রূপ—সুবিন্যস্ত, সুসমঞ্জস ও নির্দিষ্ট।

কিন্তু বিশ্বের যে-সমস্ত অঞ্চলে পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটেছে দেরিতে, অর্থাৎ মধ্য, পূর্ব কিংবা দক্ষিণ ইউরোপে অথবা ঔপনিবেশিক তত্ত্বাবধানে—যেমন এশিয়া, আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকায়—সেখানে ঐতিহাসিক বিবর্তনের এই সুসমঞ্জস রূপটি আদৌ দেখতে পাওয়া যায় না। একদিকে তাত্ত্বিক প্রতিকল্পের নির্দিষ্ট রূপ, অন্যদিকে বিভিন্ন দেশে ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিভিন্নতা—এই সমস্যাটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা শুরু হয় মার্কসের শেষজীবনের লেখাগুলিতে। তারপর লেনিনের রচনাতে পাওয়া গেল এই তাৎপর্যগুলির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কয়েকটি ইঙ্গিত। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে ধারণাটি, সেটি হল সামাজিক সম্পর্কের পুনরাবর্তনের প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্বের অসম বিকাশের সম্ভাবনা।

দ্বন্দ্বের অসম বিকাশ তখনই দেখা দেয় যখন সমাজকাঠামোর বিভিন্ন অংশে পুনরাবর্তনের প্রক্রিয়া সমান্তরালভাবে এগোয় না। অর্থাৎ অর্থনীতির ক্ষেত্রে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রক্রিয়ায় কোনও বিশেষ শ্রেণীর প্রাধান্য সমান্তরালভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা বা সাংস্কৃতিক জগতে প্রাধান্যে পরিণত নাও হতে পারে। তেমনি আবার এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিকাশ ভৌগোলিক ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্বের মৌলিকতা, বৈরিতা, প্রাধান্য ইত্যাদি গুণগুলি এক জটিল ও পরিবর্তনশীল কাঠামোয় বিন্যস্ত হয়ে থাকে। এবং পশ্চিম ইউরোপের অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত প্রতিকল্পের সাহায্যে এই দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক উত্তরণের পথ নির্দেশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এই অনির্দিষ্টতার জন্যই ইতিহাসের আলোচনায় উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গের ধারণাটি তার তাৎপর্য লাভ করেছে। শুধু পূর্ব ইউরোপ, কিংবা এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় নয়, সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, পশ্চিম ইউরোপের ক্ষেত্রেও পুঁজিবাদের উদ্ভব অথবা বুর্জোয়াশ্রেণীর সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কোনও একটি সুনির্দিষ্ট উপায়ে ঘটেনি। বরং পুঁজিবাদে উত্তরণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটির অন্তর্গত যে শ্রেণীসংগ্রাম, তার বিশিষ্ট রূপ, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বৈরিতা, মৈত্রী, সমঝোতার বিশিষ্ট রাজনৈতিক চেহারা, এক-এক দেশে এক-একভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এবং সম্ভাবনার এই বিভিন্নতার কারণ সমাজকাঠামোর বিভিন্ন অংশে দ্বন্দ্বের অসম বিকাশ। সুতরাং উৎপাদন-রীতির বিন্যাসমূলক ও বিমূর্ত বিশ্লেষণ শুরু করামাত্রই প্রয়োজন হয়ে পড়ে উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতা, ধর্মীয় জীবন, সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের জগতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের চরিত্রটিকে চিহ্নিত করা। যদি ধরে নিই, সমাজকাঠামোর প্রত্যেকটি অংশে এই দ্বন্দ্বের বিকাশ সমান্তরালভাবে এগোয়নি, তাহলে উৎপাদন-রীতির চরিত্র অনুযায়ী উৎপাদন-সম্পর্কের ধারণাটি ছাড়াও আরও কতকগুলি ধারণার প্রয়োজন দেখা দেয় যার সাহায্যে রাষ্ট্র কিংবা সংস্কৃতি-ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের বিকাশকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

এই প্রয়োজনেই 'উচ্চবর্গ'/'নিম্নবর্গ' ধারণাটির উদ্ভব। এর সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়েছে সামাজিক সম্পর্কের সেই সমতলে যেখানে ক্ষমতাই হল মূল কথা। অর্থাৎ যেখানে

প্রভুত্ব/অধীনতার এক বিশিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সামাজিক সম্পর্কটি বাঁধা থাকে। সুতরাং উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গ ধারণাটির অবস্থান উৎপাদন-সম্পর্কের সমতলে নয়, কিংবা সেটি সামাজিক শ্রেণীর কোনও বিকল্প সংজ্ঞা নয়। বরং বলা যায়, ঐতিহাসিক বিবর্তন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অসম বিকাশকে চিহ্নিত করার প্রয়োজনে উৎপাদন-সম্পর্কের সম্পূরক একটি ধারণা এটি। ফলে উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গের বিশ্লেষণ পদ্ধতি উৎপাদন-রীতির ধারণাটিকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। ঐতিহাসিক বিবর্তনের কোনও বিশেষ পর্ব বা পরিস্থিতিতে এই রীতির জটিল বিন্যাস, অসমতা ও উত্তরণের সম্ভবনার বিভিন্নতাকে বোধগম্য করে তুলতে সাহায্য করে মাত্র।

উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গ শব্দ দুটিকে শাসক শ্রেণী/শাসিত শ্রেণীর প্রতিশব্দ হিসেবেও সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা চলে না। কারণ অসম বিকাশের অবস্থায় সামাজিক ক্ষমতা সবসময় আইনবদ্ধ রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতা হিসেবে প্রতিপন্ন নাও হতে পারে। ফলে অনেক সময় সামাজিক ক্ষমতার এমন সম্পর্কেরও হদিশ পাওয়া যাবে যেখানে উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গের সম্পর্ক রাষ্ট্রক্ষমতার বিন্যাসের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক।

সমাজকাঠামোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষমতার বিন্যাস ও পুনরাবর্তনের প্রক্রিয়াগুলিকে তাদের মৌলিক উপাদানে বিভক্ত করে দেখাই উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গের বিশ্লেষণের লক্ষ্য। এই বিশ্লেষণ পদ্ধতির যেটি মূল অবলম্বন সেই ধারণাটি আমরা গ্রামশির রচনাতেও পাই। সেটি হল, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে প্রভুত্ব/অধীনতার সম্পর্কের অন্তর্নিহিত বিরোধিতা। এই বিরোধিতার তাৎপর্য কী, সে-বিষয়ে গ্রামশির লেখাতে কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কোনও স্পষ্ট তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষ নিয়ে সাম্প্রতিক আলোচনায় এই সমস্যাটিকে আরও নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ভিত্তি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

বলা হয়েছে, সমাজবিন্যাসের দিক থেকে প্রভুত্ব/অধীনতা সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন-সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিবর্তনের সম্ভাবনাগুলি প্রকাশ পায় দুটি পরস্পরবিরোধী চেতনার বৈপরীত্যে। যেমন, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্তপ্রভু/ভূমিদাস কৃষকের সম্পর্কটির রাজনৈতিক চরিত্র নিহিত রয়েছে উচ্চবর্গীয় সামন্তচেতনা ও নিম্নবর্গীয় কৃষকচেতনার বৈপরীত্যে। এই সম্পর্কের বিন্যাসগত রূপটি স্বভাবতই প্রকাশ পায় উচ্চবর্গের প্রভুত্ব ও নিম্নবর্গের অধীনতায়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা যতদিন টিকে থাকে, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার গতিতে এই প্রভুত্ব/অধীনতা সম্পর্কটাই পুনরাবর্তিত হয়। কিন্তু ইতিহাসের বিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, প্রভুত্ব/অধীনতার সম্পর্ক সামন্ততান্ত্রিক সমাজেও সম্পূর্ণ স্থিতিশীল, সমান্তরাল, সুবিন্যস্ত রূপ ধরে এগোয় না। তাতে দেখা দেয় রাজনৈতিক বিরোধ, বিদ্রোহ, বিদ্রোহ দমন, শ্রেণীদ্বন্দ্বের নানা অসম অভিব্যক্তি। এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের জন্য সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সামগ্রিক স্থায়িত্বের মধ্যেও ইতিহাসের গতি স্তব্ধ হয়ে থাকে না। সামন্তপ্রভু ও কৃষকের পারস্পরিক সম্পর্কের রাজনৈতিক, আইনগত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সবদিক থেকেই ঘটে নানা পরিবর্তন। এবং এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্যেই নিহিত থাকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সামগ্রিক বিবর্তনের সম্ভাবনা।

Scanned with CamScanner

ফলে সামন্ততন্ত্রের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে পড়ে উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গের চেতনার বৈপরীত্যকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা। যেহেতু প্রভুত্ব/অধীনতা সম্পর্কটির বিপরীত মেরুতে অবস্থিত দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণী, এবং যেহেতু এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের রাজনৈতিক প্রকাশের ক্ষেত্রে দুটি শ্রেণীই সক্রিয়, কেবল উচ্চবর্গই সক্রিয় আর নিম্নবর্গ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় এমন নয়, সুতরাং ধরে নিতে হয় উচ্চবর্গের চেতনার বিপরীত অবস্থানে নিম্নবর্গের চেতনাও কোনও না কোনওভাবে তার স্বকীয়তা, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়। তা যদি না হত, তাহলে শ্রেণীদ্বন্দ্বের কোনও রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটা সম্ভব হত না। বস্তুত তাহলে কোনও দ্বন্দ্বই থাকত না, নিম্নবর্গের অস্তিত্ব উচ্চবর্গের চেতনার সার্বিকতায় সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যেত।

কিন্তু উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গ সম্পর্কের মধ্যে দুটি চেতনার স্বাতন্ত্র্যও যেমন সত্য, উচ্চবর্গের প্রভুত্ব ও নিম্নবর্গের অধীনতাও তেমনি সমানভাবেই সত্য। অর্থাৎ নিম্নবর্গের চেতনা স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও পরাধীন। এই দ্বান্দ্বিক রূপটিকে অবলম্বন করেই নিম্নবর্গের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ঐতিহাসিক মালমশলা স্বভাবতই রচিত ও রক্ষিত হয় উচ্চবর্গের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে। এই মালমশলার মধ্যে নিম্নবর্গের চেতনার স্বতন্ত্র রূপটির আবির্ভাব ঘটে কদাচিৎ। অধিকাংশ সময়ই নিম্নবর্গকে দেখা যায় নিষ্ক্রিয়, ভীরু, একান্ত অনুগত একটি জীব হিসেবে। অন্যে চালিত করলে তবেই যেন সে চলে। একমাত্র প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিরোধ, বিশেষ করে বিদ্রোহের সময়ই শাসকগোষ্ঠী তাকে সক্রিয় প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রাহ্য করে। এই ধরনের ঐতিহাসিক বিবরণগুলির মধ্য থেকে নিম্নবর্গের চেতনার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য, অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য/পরাধীনতার দ্বৈত চরিত্রটি উদ্‌ঘাটন করাটা নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার একটা বিশেষ দিক হিসেবে গৃহীত হয়েছে। রণজিৎ গুহ-র *এলিমেন্টারি আসপেক্টস অফ পেজাণ্ট ইনসার্জেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া* গ্রন্থটি প্রধানত এই সমস্যা নিয়ে। এতে তিনি দেখিয়েছেন, কৃষকবিদ্রোহকে কতকগুলি অর্থনৈতিক শর্ত দিয়ে সরাসরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আপাতদৃষ্টিতে যে বিদ্রোহকে মনে হয় আকস্মিক, কিছু অবাস্তব কল্পনার দ্বারা চালিত, আসলে তা কিন্তু এই অর্থে 'স্বতঃস্ফূর্ত' নয়। তার পিছনে থাকে প্রস্তুতি, সংগঠন, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের নির্দিষ্ট একটা ছক। এই ছক নিহিত রয়েছে কৃষকচেতনায়। বিদ্রোহের উদ্দেশ্য, তার অলীক চরিত্র, এবং রাজনৈতিক পরিণতি হিসেবে তার অনিবার্য ব্যর্থতা, এ-সবেরই যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে কৃষকচেতনার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য/বৈপরীত্যের দ্বান্দ্বিক রূপটিতে।

নিম্নবর্গের ইতিহাসের অপর আলোচ্য বিষয় হল ঐতিহাসিক উত্তরণের সমস্যা। এর অন্তত দুটি দিক আছে। একটি হল, উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গের রাজনৈতিক সংগ্রামের ফলস্বরূপ সমাজকাঠামোয় মৌলিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা কতদূর? অন্যটি হল, নিম্নবর্গের চেতনার পৃথক ও স্বতন্ত্র রূপটিতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে কি? পরিবর্তন ঘটলে তা কীভাবে ঘটে? প্রথম প্রশ্নটির বলা বাহুল্য কোনও সরল কিংবা সাধারণভাবে প্রযোজ্য উত্তর নেই। কারণ এই সম্ভাবনাগুলো একান্তই নির্ভর করে বিশেষ ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের অসম বিকাশের ফলে সৃষ্ট বিরোধগুলির ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী বা জনসমষ্টির রাজনৈতিক

ভূমিকা ও পারস্পরিক শক্তির উপর। উত্তরণ-প্রক্রিয়ার কোনও সাধারণ নিয়ম এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার করা যায়নি। তবে উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গ বিশ্লেষণ পদ্ধতি যাঁরা অনুসরণ করেন, তাঁদের বিশ্বাস উত্তরণ-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শ্রেণীসংগ্রামের রাজনৈতিক প্রকাশ ও শ্রেণীচেতনার বৈপরীত্য গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে এই সাধারণ নিয়মগুলি নির্ধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। বিশেষ করে, শ্রেণীসম্পর্কের জটিল বিন্যাস এবং সমাজকাঠামোর বিভিন্ন স্তরে ও ভৌগোলিক ব্যাপ্তিতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অসম বিকাশকে আরও স্পষ্টভাবে বোধগম্য করে তোলা যাবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটিও সমস্যাকণ্টকিত। উচ্চবর্গের চেতনার স্বরূপ ও তার নিজস্ব বিবর্তনের ধারা ঐতিহাসিকদের কাছে অনেক বেশি সহজবোধ্য। নিম্নবর্গের চেতনার সন্ধান জানা যায় নানা জটিল বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে। এই মুহূর্তে এই বিশ্লেষণপদ্ধতিগুলি যে অভিনব এবং অপেক্ষাকৃত অনির্দিষ্ট, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিশেষ দেশ-কালের সীমানার মধ্যে এই বিশ্লেষণ নিম্নবর্গের চেতনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে সাহায্য করছে কি না, তা বিচার করার একমাত্র মানদণ্ড হল সমাজ পরিবর্তনের বৈপ্লবিক রাজনীতির মানদণ্ড। পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও রাষ্ট্রের অধীন যে আধুনিক সমাজব্যবস্থা, তার ঐতিহাসিক উত্তরণের ক্ষেত্রে কৃষকচেতনার একক, এমন কি প্রধান ভূমিকাও থাকা সম্ভব নয়। বুর্জোয়া চেতনার সমগ্রতা, তার ঐতিহাসিক নিশ্চয়তা, ক্ষমতা ব্যবহারের নানা জটিল প্রক্রিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, এমন কোনও শ্রেণীচেতনার নেতৃত্বে বৈপ্লবিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা ছাড়া কৃষকশ্রেণীর ঐতিহাসিক পরাধীনতার অবসান সম্ভব নয়। মার্কসবাদের আদিযুগ থেকেই এ সত্য সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিশ্বব্যাপী প্রসারের পরেও যে বহু দেশে এক বিশাল কৃষকশ্রেণী তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দীর্ঘদিন বজায় রেখে চলবে, এমন সম্ভাবনার কথা উনিশ শতকের ইউরোপীয় মার্কসবাদীরা ভাবেননি। তখন মনে করা হত, কৃষকশ্রেণীর অবলুপ্তি পুঁজিবাদী উৎপাদনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—নির্মম, রক্তক্ষয়ী, কিন্তু অনিবার্য। অথচ ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব থেকেই দেখা গেছে, তথাকথিত অনুন্নত দেশগুলিতে ঐতিহাসিক উত্তরণ সম্ভব হয়েছে ব্যাপক কৃষক জনসমষ্টির প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এক বৃহত্তর সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর অঙ্গীভূত হয়ে নয়, তাদের জীবিকা, জীবনধারণ ও চেতনার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বৈপ্লবিক ঐক্যের মধ্য দিয়ে।

সুতরাং ভারতবর্ষের মতো কৃষিজীবীবহুল দেশে কৃষকচেতনার পরিবর্তনের সমস্যা কোনও ঐতিহাসিক অনিবার্যতার ধারণা দিয়ে সমাধান করা যাবে না। আধুনিক পুঁজিবাদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়তে সক্ষম এমন শ্রেণীচেতনার সঙ্গে বৈপ্লবিক ঐক্যের সম্ভাবনার মধ্যেই এর সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। এইজন্যই আন্তোনিও গ্রামশি বলেছিলেন, সাবল্টার্ন শ্রেণীর জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, ভাবাদর্শ গভীরভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। আজকের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও সেই কারণে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব তথা বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গ দ্বন্দ্বের জটিল বিন্যাস ও অসমতা, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও অঞ্চলে সেই দ্বন্দ্বের নানা ধরনের বহিঃপ্রকাশ, এবং এই অসমতার মধ্যে বৈপ্লবিক ঐক্যের সন্ধান করা।

Scanned with CamScanner

৩

১৯৭০-এর দশকে ভারতের মার্কসবাদী রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে উত্তপ্ত বাদানুবাদ ঘটে যায়, 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর শিকড় খুঁজে পাওয়া যাবে সেই অসম্পূর্ণ বিতর্কে। ওপরে উদ্ধৃত প্রবন্ধটিতেও তার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বিতর্ক জমে উঠেছিল ওই সময়। একটিতে অংশ নেন প্রধানত অর্থনীতিবিদেরা, যাঁদের আলোচ্য ছিল ভারতবর্ষের কৃষি-অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উৎপাদনরীতির উদ্ভব। এক পক্ষের বক্তব্য ছিল, ঔপনিবেশিক আমলের শেষ পর্ব থেকেই ভারতের কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। কৃষিপণ্যের বিশ্বব্যাপী বাজার এবং বড়মাপের সংগঠিত অর্থলগ্নী ব্যবস্থার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়ে বড়-মাঝারি-ছোট সবরকম উৎপাদনই এখন পুঁজীবাদী উৎপাদন-রীতির নিয়ম মেনে চলতে শুরু করেছে। অন্য পক্ষ দেখাবার চেষ্টা করে যে কোনও কোনও এলাকায় সীমিত কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থা এখনো অটুট রয়েছে। বৃহত্তর বাজার বা লগ্নীব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েও প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজের মৌলিক রূপান্তরের কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি। অন্য বিতর্কটি হয় প্রধানত ঐতিহাসিকদের মধ্যে। সেখানে আলোচ্য ছিল উনিশ শতকের বাংলায় তথাকথিত নবজাগরণ। জাতীয়তাবাদী, এমন কি মার্কসবাদী ইতিহাসেও দীর্ঘদিন ধরে 'নবজাগরণ'-এর মণীষীদের 'প্রগতিশীল' ভূমিকা একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অধিকার করে ছিল। সত্তর দশকে অশোক সেন, রণজিৎ গুহ, সুমিত সরকার ইত্যাদি ঐতিহাসিক প্রশ্ন তুললেন, রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ মণীষীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রগতিশীল কোন অর্থে? তাঁদের সংস্কার-চিন্তা তো ঔপনিবেশিক অর্থনীতি-রাজনীতির সীমানা ছাড়িয়ে এগোতে চেষ্টা করেনি। বস্তুত ব্রিটিশ শাসনের প্রগতিশীলতার ওপর আস্থা রেখেই তো তাঁদের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার শুরু, আর সেই শাসনক্ষমতার সীমাবদ্ধতাই তাঁদের সংস্কার-প্রচেষ্টার সীমা। ঔপনিবেশিক ভারতে ক্ষমতার বিন্যাস নিয়ে কোনও মৌলিক প্রশ্ন 'নবজাগরণ'-এর নায়কেরা তোলেননি, বরং সেই ক্ষমতাবিন্যাসকে অবলম্বন করেই তাঁরা সামাজিক প্রগতি আনার চেষ্টা করেছেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়া অনিবার্য ছিল।

সমাজবিজ্ঞান-ইতিহাস নিয়ে লেখাপড়ার জগতে এই দুটি বিতর্ক যে-সময় ওঠে, তার অল্প কদিন আগেই ভারতের বামপন্থী রাজনীতি আর-একটি বিতর্কে আন্দোলিত হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের নকশালবাড়ি কৃষক-সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাত শুধুমাত্র কিছুটা ক্ষণস্থায়ী চাঞ্চল্য, রক্তক্ষয় আর রাজনৈতিক ব্যর্থতাতেই নিঃশেষ হয়ে যায়নি। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষমতাবিন্যাসের প্রশ্নটি জাতীয় রাজনীতির মঞ্চে এমনই নাটকীয়ভাবে উপস্থিত করতে পেরেছিল সেই আন্দোলন, যে সেই প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করা ছিল অসম্ভব। রাজনৈতিক সংগ্রাম পর্যুদস্ত হয়ে যাওয়ার অনেক পরেও তাই সে-প্রশ্নটি সমাজবিজ্ঞানে, ইতিহাসে, শিল্পকলায়, সাহিত্যে, নাটকে, সিনেমায় নানাভাবে প্রতিফলিত হতে থাকে। যে-দুটি পণ্ডিতি বিতণ্ডার কথা ওপরে বললাম, তাতেও যে বিভিন্ন দিক থেকে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা চলেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেই অসম্পূর্ণ বিতর্কের পটভূমিতে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' আবার ওই

ক্ষমতাবিন্যাসের প্রশ্নটিকে নতুনভাবে তুলতে সক্ষম হয়।

সাবলটার্ন স্টাডিজ প্রথম খণ্ডের গোড়ায় রণজিৎ গুহ রচিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যাকে পরবর্তীকালে অনেকে নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চার 'ম্যানিফেস্টো' বলে অভিহিত করেছেন। এই প্রবন্ধের প্রথম লাইনেই বলা হয়, 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাস-রচনায় দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক উচ্চবর্গ আর বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী উচ্চবর্গের আধিপত্য চলে আসছে।' নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চার উদ্দেশ্য হল এই দুই ধরনের উচ্চবর্গীয় আধিপত্যের বিরোধিতা করা। স্মরণ করা যেতে পারে, ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে দুটি বিবদমান গোষ্ঠীর ঝগড়া এই সময় তুঙ্গে। এক দিকে কিছু ব্রিটিশ ও মার্কিন ঐতিহাসিক দেখাবার চেষ্টা করছিলেন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আসলে মুষ্টিমেয় কিছু উচ্চবর্গের নীতিহীন আদর্শহীন ক্ষমতা দখলের কৌশল মাত্র। চিরাচরিত জাতি-ধর্ম-সাম্প্রদায়িক আনুগত্যের বন্ধনকে কাজে লাগিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সেখানে শুধুমাত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা এর তুমুল প্রতিবাদ করে বলছিলেন জাতীয়তাবাদী আদর্শের কথা, জাতীয়তাবাদী নেতাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কথা, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ব্যাপক জনসাধারণের অংশগ্রহণের কথা। রণজিৎ গুহ-র প্রবন্ধে ঘোষণা করা হল, এই দুটি ইতিহাস আসলে উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি-প্রসূত, কারণ দুটি ইতিহাসই ধরে নিয়েছে যে জাতীয়তাবাদ হল উচ্চবর্গের ক্রিয়াকলাপের ফসল। বিবাদ শুধু সেই ক্রিয়াকলাপের নৈতিক চরিত্র নিয়ে—তা সংকীর্ণ ব্যক্তি বা শ্রেণীস্বার্থের সাময়িক যোগফল, নাকি আদর্শ আর স্বার্থত্যাগের জাদুকাঠির স্পর্শে ব্যাপক জনসাধারণের চেতনার উন্মেষ। এই দুটি ইতিহাসের কোনওটাতেই জনগণের নিজস্ব রাজনীতির কোনও স্থান নেই।

সাম্রাজ্যবাদী আর জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের বিরোধিতার পথ ধরেই নিম্নবর্গের ইতিহাসের প্রথম কর্মসূচি নির্দিষ্ট হল। আগেই বলেছি, দুটি বিষয় এখানে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। এক, ঔপনিবেশিক আর দেশীয়, দু-ধরনের উচ্চবর্গের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আর পদ্ধতির সঙ্গে নিম্নবর্গের রাজনীতির পার্থক্য। দুই, নিম্নবর্গীয় চেতনার নিজস্বতা। প্রথম বিষয়টি অনুসরণ করতে গিয়ে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর ঐতিহাসিকেরা দেখালেন যে শুধুমাত্র দেশীয় উচ্চবর্গের অঙ্গুলিহেলনে নিম্নবর্গের দল জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়েছিল, সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের এই অভিযোগ যেমন সত্য নয়, তেমনি জাতীয়তাবাদী নেতাদের আদর্শ আর অনুপ্রেরণার স্পর্শ পেয়ে তবে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনা জেগে উঠল, এই দাবিও সত্য নয়। উচ্চবর্গ পরিচালিত জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মঞ্চে নিম্নবর্গ প্রবেশ করেছিল ঠিকই। আবার বহুক্ষেত্রে নানা অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও তারা সেখানে প্রবেশ করতে আদৌ রাজি হয়নি, অথবা একবার প্রবেশ করে পরে সরে এসেছিল। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, পদ্ধতি ছিল উচ্চবর্গের তুলনায় পৃথক। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ক্ষেত্রেও নিম্নবর্গের জাতীয়তাবাদ ছিল উচ্চবর্গের জাতীয়তাবাদের তুলনায় ভিন্ন।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি এসেছে প্রথমটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে। নিম্নবর্গের রাজনীতির ধরনধারণ

Scanned with CamScanner

যদি স্বতন্ত্র হয়, সেই স্বাতন্ত্র্যের সূত্র কোথায়? তা নির্ধারিত হচ্ছে কোন নিয়মে? উত্তর হল, নিম্নবর্গের রাজনীতির চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে নিম্নবর্গের নিজস্ব চেতনার রূপরেখা অনুসারে। সেই চেতনা গড়ে উঠেছে অধীনতার অভিজ্ঞতা থেকে। দৈনন্দিন দাসত্ব, শোষণ আর বঞ্চনার মধ্যেও নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার সংগ্রামের ভেতর দিয়ে। সে চেতনার পরিচয় পাওয়া যাবে কোথায়? ঐতিহাসিক নথিপত্রে নিম্নবর্গের চেতনার সরাসরি সাক্ষ্য প্রায় কোথাওই পাওয়া যায় না। কারণ সেই নথি তৈরি করেছে উচ্চবর্গেরা। সাধারণ অবস্থায় নিম্নবর্গকে সেখানে কেবল প্রভুর আদেশপালন করতেই দেখা যায়। একমাত্র একটি মুহূর্তেই শাসককুলের মানসপটে নিম্নবর্গ আবির্ভূত হয় স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে। সেই মুহূর্তটি হল বিদ্রোহের মুহূর্ত। নিম্নবর্গ যখন বিদ্রোহী, তখনই হঠাৎ শাসকবর্গের মনে হয়, দাসেরও একটা চেতনা আছে, তার নিজস্ব স্বার্থ আর উদ্দেশ্য আছে, কর্মপদ্ধতি আছে, সংগঠন আছে। উচ্চবর্গের তৈরি করা সাক্ষ্যপ্রমাণের মহাফেজখানায় যদি নিম্নবর্গের চেতনার খোঁজ করতে হয়, তবে তা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে বিদ্রোহ আর বিদ্রোহদমনের ঐতিহাসিক দলিলে।

এই কারণেই প্রথম পর্বের সাবলটার্ন স্টাডিজ-এর গবেষণায় একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস। রণজিৎ গুহ-র *এলিমেন্টারি আসপেক্টস্* গ্রন্থের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু এ-ছাড়াও *সাবলটার্ন স্টাডিজ* সংকলনে এবং তার বাইরে অন্যান্য জায়গায় নানা প্রবন্ধে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস অনুসন্ধান করে বিদ্রোহী কৃষকচেতনার পরিচয় দেবার চেষ্টা করলেন। এই চেষ্টার ফলে অল্প কিছু নতুন সূত্র আবিষ্কার হল, বিদ্রোহী কৃষক যেখানে তার নিজের কথা বলে গেছে। কিন্তু জানাই ছিল, এমন সূত্র খুব বেশি পাওয়া যাবে না। ইতিহাস-রচনার প্রকরণ হিসেবে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়ে দেখা দিল কৃষকবিদ্রোহের পরিচিত নথিপত্রগুলোকেই নতুনভাবে পড়ার কৌশল। শাসকবর্গের প্রতিনিধিরা যেখানে কৃষকবিদ্রোহের রিপোর্ট দিচ্ছে রাষ্ট্রশক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, সেই সরকারি রিপোর্টের বর্ণনাকেই বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উল্টো করে পড়লে বিদ্রোহী কৃষকচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়—নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা এর অনেক উদাহরণ এনে হাজির করলেন। তাঁরা আরও দেখালেন উচ্চবর্গের ঐতিহাসিকেরা, এমন কি প্রগতিশীল এবং শোষিত শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ঐতিহাসিকেরাও যখন তাঁদের যুক্তিবাদী ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে কৃষকচেতনায় উপস্থিত ধর্মবিশ্বাস, অলৌকিকতা, মিথ, দৈবশক্তিতে আস্থা, অলীক কল্পনা প্রকৃতিকে অযৌক্তিক মনে করে উপেক্ষা করেন বা সে-সবের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা খাড়া করে একরাশ মিথ্যার ভেতর থেকে সঠিক ইতিহাসটুকু বের করে আনার চেষ্টা করেন, তখন তাঁরা কৃষকচেতনার বিশিষ্ট উপাদানগুলোকেই আসলে হারিয়ে ফেলেন। হয়তো নিজেদের অগোচরেই তাঁরা নিম্নবর্গের রাজনীতিকে উচ্চবর্গের চেতনার ছকে ফেলে বোধগম্য করার চেষ্টা করেন। নিম্নবর্গের নিজস্ব ইতিহাস, অথবা অনাভাবে বললে, ইতিহাসে নিম্নবর্গের কীর্তির স্বাক্ষর কিন্তু সেখানে হারিয়ে যায়।"

৪

'সাবলটার্ন স্টাডিজ' নিয়ে গোড়ার দিকে সমালোচনাতে দুধরনের আপত্তি উঠেছিল। একটি আপত্তির লক্ষ ছিল উচ্চবর্গ আর নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পৃথকীকরণ। দুটি ক্ষেত্র কি সত্যিই ততটা পৃথক? অথবা, কোনও এক প্রাক-জাতীয়তাবাদী বা প্রাক-ধনতান্ত্রিক ঐতিহাসিক অবস্থায় তা পৃথক হয়ে থাকলেও, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গণতান্ত্রিক প্রভাবে দুটি ক্ষেত্র কি ক্রমশ একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে যায়নি? বিশ্লেষণের লক্ষ্য হিসেবে উচ্চবর্গের আর নিম্নবর্গের রাজনীতির পার্থক্যের ওপর অতটা জোর দেওয়ার তাৎপর্য কী? তাতে কি নানা ধরনের বিভেদকামী, বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতিকেই পরোক্ষে সমর্থন জানানো হচ্ছে না?

দ্বিতীয় আপত্তি নিম্নবর্গীয় চেতনা নিয়ে। প্রগতিশীল ইতিহাস চিন্তার প্রথম উপপাদ্য হল, মানবচেতনার বিকাশ, চেতনার অনুন্নত বা আদিম অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে উন্নত চেতনার দিকে অগ্রসর হওয়া। এই প্রগতির তত্ত্ব যেমন একটা গোটা সমাজ বা সভ্যতার বেলায় খাটে, তেমনি সমাজের আভ্যন্তরীণ বিভাজনের ক্ষেত্রেও খাটে। অর্থাৎ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আর্থিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ক্ষমতাভোগী শ্রেণীর চেতনার স্তরও অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়। সামাজিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে সেই শ্রেণী বা তার কোনও অংশ যদি অগ্রগামী ভূমিকা নেয়, তাহলে তার চেষ্টায় অন্যান্য শ্রেণীর চেতনার মানও ক্রমশ উন্নত হয়ে উঠতে পারে। নিম্নবর্গের চেতনার স্বাতন্ত্র্যের কথা তুলে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা কি চৈতন্যের স্তরভেদ, তার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ, এবং সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে উন্নত চেতনার অধিকারী অগ্রগামী শ্রেণীর ভূমিকাকে অস্বীকার করছেন? তাঁরা কি উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের চেতনার বিচারে উন্নত/পশ্চাৎপদ, এই তুলনাটাই মানতে চাইছেন না? তাঁরা কি বলছেন, ওই দুটি চেতনা ভিন্ন, স্বতন্ত্র নিয়ম অনুযায়ী গঠিত, অতএব তাদের মধ্যে তুলনার কোনও সাধারণ মাপকাঠি নেই?

জাতীয়তাবাদী এবং মার্কসবাদী, দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এই প্রশ্নগুলি তোলা হয়েছিল। এবং দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রশ্নগুলি অত্যন্ত ন্যায্য প্রশ্ন ছিল। জাতীয়তাবাদী অবস্থান থেকে নিম্নবর্গের ইতিহাস লেখার প্রস্তাবকে ঐকাবদ্ধ জাতি-রাষ্ট্রের জীবনবৃত্তান্তের পরিপন্থী বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আর প্রগতিবাদী-বামপন্থী অবস্থান থেকেও নিম্নবর্গের চৈতন্যের নিজস্ব গড়ন আর তার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক উদ্যমের ওপর জোর দেওয়ার মানে অগ্রগামী বুর্জোয়া-বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী এবং বৈপ্লবিক পার্টি সংগঠনের প্রগতিশীল ভূমিকা একরকম অস্বীকার করা। দুটি ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের উত্তর ছিল, নিম্নবর্গের অবস্থান থেকে দেখলে জাতীয়তাবাদী আর প্রগতিবাদী-বামপন্থী ইতিহাসের কর্মসূচীর ভেতরে যে নিম্নবর্গের কোনও স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক ভূমিকা থাকছে না, এটা প্রমাণ করাই নিম্নবর্গের ইতিহাসের উদ্দেশ্য। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের কাজ হল প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস-রচনার সমালোচনা করা। নিম্নবর্গের ইতিহাস তাই সবসময়ই বিরোধী ইতিহাস। বিকল্প ইতিহাসরচনা-পদ্ধতির কোনও পরিপূর্ণ কর্মসূচী নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক দিতে পারেন না। *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা লিখতে গিয়ে রণজিৎ

Scanned with CamScanner

গুহ তাই লিখলেন, 'একজন সমালোচক আমাদের তিরস্কার করে বলেছেন, আমরা নাকি সব প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস রচনা-পদ্ধতিরই বিরোধী। এ অভিযোগ সত্যি। নিম্নবর্গ যে তার নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারে, এ-কথা স্বীকার করে না বলে ইতিহাস আর সমাজবিজ্ঞান চর্চার অধিকাংশ রীতি-নীতি-পদ্ধতিরই আমরা বিরোধিতা করি। এই বিরোধিতাই আমাদের প্রকল্পের চালিকাশক্তি।'

বিরোধী বা ক্রিটিকাল ইতিহাসরচনা। প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসরচনার পদ্ধতি আছে, থাকবে। উচ্চবর্গের আধিপত্যও আছে, থাকবে। অন্তত ইতিহাস লিখে সে-আধিপত্যের অবসান ঘটানো যাবে না। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক তাহলে কী করতে পারেন? তিনি বিরোধী ইতিহাস লিখতে পারেন, যেখানে উচ্চবর্গের আধিপত্য অস্বীকার করে নিম্নবর্গ তার নিজের ঐতিহাসিক উদ্যমের কথা বলতে পারে। নিজের ক্রিয়াকলাপের কর্তা হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করতে পারে। সে ইতিহাস কখনওই পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাসের সামগ্রিকতা অর্জন করতে পারবে না। নিম্নবর্গ কখনওই গোটা সমাজের হয়ে কথা বলতে পারবে না। নিম্নবর্গের ইতিহাস তাই অনিবার্যভাবে আংশিক, অসংলগ্ন, অসম্পূর্ণ।

বলা বাহুল্য, এইরকম খণ্ডিত, প্রায়শই অসংলগ্ন, ইতিহাসরচনার পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে অনুসরণ করে যাওয়া সহজ নয়। পেশাদার গবেষণার জগতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের জগতে, রাজনৈতিক বাদানুবাদের জগতে নতুন লেখকগোষ্ঠীর কাছে স্বভাবতই একটা প্রত্যাশা থাকে যে তাদের মৌলিক গবেষণার কাজ প্রচলিত ভাবনাচিন্তাকে একটা নতুন দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে। যে সব সমস্যার সমাধান প্রচলিত বাকবিতণ্ডার ভেতর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তার একটা নতুন সমাধানের ইঙ্গিত দেবে। তারা যদি প্রতিষ্ঠিত মতবাদের বিরোধিতা করে, তবে বিকল্প কোনও মতবাদকে এখনই উপস্থিত করতে না পারলেও, তেমন এক সামগ্রিক বিকল্প নির্মাণ করার প্রচেষ্টাটুকু অন্তত তারা সমর্থন করবে, এমন আশা করা নিশ্চয় অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' এই প্রত্যাশা পূরণ করতে রাজি হয়নি।

বিষয়টা নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে, তাই খানিকটা বিশদ আলোচনা করলে হয়তো সুবিধা হয়।

সাবলটার্ন স্টাডিজ-এর প্রথম পর্বের কাজে এমন একটা বিকল্প মতবাদের ইঙ্গিত অনেকে দেখেছিলেন। আগেই বলেছি, *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর গবেষণা প্রধানত কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে শুরু হয়। রাজনৈতিক চেতনাহীন নিষ্ক্রিয় কৃষকের ধারণার বিরোধিতা করে *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর ঐতিহাসিকেরা দেখাবার চেষ্টা করেন যে বিদ্রোহী কৃষক আসলে এক স্বকীয়, সৃজনশীল এবং বিশিষ্ট চৈতন্যের অধিকারী। বলা বাহুল্য, ঔপনিবেশিক এবং জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের উচ্চবর্গীয় পক্ষপাতিত্বের বিরোধিতায় এই পদ্ধতি খুব উপযোগী ছিল। কিন্তু উলটো এক বিপদের সম্ভাবনাও তাতে নিহিত ছিল। তা হল কৃষকসমাজ নিয়ে এক ধরনের রোমান্টিকতা, যা রাশিয়ার নারদনিক দলগুলি থেকে শুরু করে এ-দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে কৃষক বিপ্লবের বিভিন্ন প্রচেষ্টায় বহুবার দেখা গিয়েছে। অস্বীকার করে লাভ নেই, ১৯৬০-এর আর ১৯৭০-এর দশক

দুটির রাজনৈতিক বাদানুবাদ এবং নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানের আপাত বিপর্যয়ের পটভূমিতে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এ কৃষকবিদ্রোহের ইতিহাসচর্চা প্রায় অনিবার্যভাবেই এক ধরনের নকশালি রাজনীতির রোমান্টিক রোমন্থন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। এও সত্যি যে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী ইতিহাসরচনাকে সমালোচনা করতে গিয়ে *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর একাধিক লেখক প্রচ্ছন্নভাবে হলেও এ ধরনেরই কোনও বিকল্প রাজনৈতিক অবস্থানকে অবলম্বন করেছিলেন। আর এক সম্ভাবনাও গোড়ার দিকের *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর লেখায় অনেকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তা হল এক ধরনের রোমান্টিক স্বদেশিয়ানা—বিদেশ থেকে আমদানি করা যন্ত্রসভ্যতা আর আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিধ্বংসী ইতিহাসের হাত থেকে যা আমাদের নিষ্কৃতি দিতে পারে, যার নিরাপদ ছায়ায় বসে মনে হয় দেশজ কৃষকসমাজের জ্ঞানভাণ্ডার এবং ব্যবহারিক জীবনের ঐতিহ্যই আমাদের প্রকৃত আদর্শ সমাজ গঠনের পথ বাতলে দিতে পারে। *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর কোনও লেখায় ঠিক এইরকম ইঙ্গিত কখনও করা হয়েছিল বলে আমার জানা নেই, কিন্তু পরবর্তী সময়ে একাধিক সমালোচক *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর মধ্যে এই জঙ্গি স্বদেশিয়ানার গন্ধ পেয়েছেন। তার কারণ তাঁদের ঘ্রাণশক্তির অসাধারণ প্রখরতা না কি ওরকম একটা তকমা এঁটে দিতে পারলে গালাগাল করতে সুবিধে হয়, এর উত্তর নিশ্চিতভাবে জানি না।

আসলে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসচর্চার মহলে যে-ভূমিকায় *সাবলটার্ন স্টাডিজ* সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ছিল, সেটা হয় এক ধরনের র‍্যাডিক্যাল সামাজিক ইতিহাস কিংবা 'হিসট্রি ফ্রম বিলো'—তল থেকে দেখা ইতিহাস। সত্তর-আশির দশকে ইউরোপে এই ধরনের ইতিহাস লেখার খুব চল হয়েছিল। ক্রিস্টোফার হিল, এডোয়ার্ড টমসন, এরিক হব্‌সবম প্রভৃতি ইংরেজ মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের ধারা অনুসরণ করে অনেকেই তখন ইউরোপের পুঁজিবাদ আর যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির ঢক্কানিনাদে চাপা পড়ে যাওয়া বিস্মৃত, অবহেলিত জনগোষ্ঠী ও তাদের ভিন্নতর জীবনযাত্রার কথা লিখছিলেন। এই 'তল থেকে দেখা ইতিহাস' প্রধানত ইতিহাস রচনায় বাদ পড়ে যাওয়া অনেক ঘটনা, মতাদর্শ, স্মৃতি খুঁজে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছিল। বিশেষ করে যে সব ঘটনা বা আন্দোলন ছিল নিতান্তই আঞ্চলিক এবং ক্ষণস্থায়ী, সেই সব ঘটনার পৃথক পৃথক কাহিনী এবং বিশিষ্ট তাৎপর্যকে চিহ্নিত করে বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মূলধারার বর্ণনাটিকে অনেক বেশি জটিল ও বর্ণাঢ্য করে তুলেছিল এই নতুন সামাজিক ইতিহাস। ইতিহাসচর্চার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই ধারাটি তখন প্রচলিত ছিল বলে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর লেখাগুলিতে তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর লেখকেরাও যে ইউরোপের র‍্যাডিক্যাল সামাজিক ইতিহাসের কাজ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু এক জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ তফাত ছিল। পশ্চিমী দুনিয়ায় আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের বিশাল ইমারতের তল থেকে খুঁজে খুঁজে এইসব বিস্মৃত কাহিনী বের করে আনার ফলে সেই ইমারত কী করে তৈরি হল, তার বর্ণনাটি আরও বিশদ ও পরিপূর্ণ হল সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই ইমারতের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব এবং

Scanned with CamScanner

ঐতিহাসিক ন্যায্যতা সম্বন্ধে কোনও মৌলিক প্রশ্ন সেখানে ওঠার সম্ভাবনা ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'তল থেকে দেখা' ইতিহাসের কাহিনী বাঁধা হত ট্র্যাজেডির সুরে। শোষিত অবহেলিত মানুষের বঞ্চনা আর নিপীড়নের গল্প সেখানে মর্মান্তিক, তাদের প্রতিরোধ হয়তো-বা সহনীয়, কিন্তু গল্পের শেষে তাদের পরাজয় অনিবার্য। এ-সব গল্পের প্রভাবে ইতিহাসের মূল গতিপথ এক চুলও এদিক-ওদিক নড়ার সম্ভাবনা ছিল না।

ভারতবর্ষের মতো দেশের ক্ষেত্রে 'তল থেকে দেখা' ইতিহাসকে কিন্তু এরকম কোনও ছকের ভেতরে বেঁধে রাখা কঠিন ছিল। ভারতে পুঁজিবাদী আধুনিকতার বিবর্তনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে গল্পের শেষটা অত নিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া যায়নি। বিশ্বের অন্যত্র যা ঘটেছে, ভারতে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে, এই ফর্মুলাটা যদি মাথায় চেপে বসে না থাকে, তাহলে 'তল থেকে দেখা' ভারতীয় ইতিহাসের লেখক সহজেই দেখতে পাচ্ছিলেন যে তাঁর গবেষণার উপাদান থেকে বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক মৌলিক প্রশ্ন তোলার সুযোগ খোলা রয়েছে। আগেই বলেছি, লিবেরাল জাতীয়তাবাদ এবং মার্কসবাদ, দুধরনের ইতিহাসরচনার প্রতিষ্ঠিত ছক সম্বন্ধেই 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর লেখকদের মনে সংশয় ছিল। র‍্যাডিকাল সামাজিক ইতিহাসের চর্চায় নেমে তাঁরা তাঁদের বর্ণনাকে কোনও নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে বেঁধে রাখতে চাইলেন না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পরিণতি আধুনিক সমাজের কোনও নির্দিষ্ট ও পরিচিত ধারণার বাস্তবায়ন, এই কাহিনীসূত্রটি তাঁরা বারে বারেই অস্বীকার করতে লাগলেন তাঁদের লেখায়। তাই 'তল থেকে দেখা' ইতিহাস হিসেবেও 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর লেখা বেশ অস্বস্তির কারণ হয়ে রইল ইতিহাসচর্চার মহলে।

৫

সাবলটার্ন স্টাডিজ-এর প্রথম পর্বের কাজের সবচেয়ে মৌলিক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক-এর দুটি প্রবন্ধে।[১] ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষক বিদ্রোহ নিয়ে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর গবেষণার দুটি বৈশিষ্ট্যের দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে, ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের যা পরিধি, নিম্নবর্গের রাজনীতি তার বাইরেও বটে, আবার ভেতরেও বটে। যে অর্থে তা বাইরে, সেই অর্থে নিম্নবর্গের রাজনীতি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থা অথবা ভাবাদর্শের তুলনায় স্বতন্ত্র। কিন্তু তা আবার ভেতরেও বটে, কারণ বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে নিম্নবর্গের রাজনীতি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে, তাকে সুবিধেমতো ব্যবহার করছে, হয়তো বা একরকমভাবে আত্মস্থ করছে। এই গবেষণার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, একদিকে নিম্নবর্গীয় সত্তা বা চৈতন্যের একটা বিশুদ্ধ আকৃতির ধারণা, অন্যদিকে ঐতিহাসিক মালমশলায় বারেবারেই এটা আবিষ্কার করা যে নিম্নবর্গের উপস্থিতি ঘটছে বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন চেহারায়। এমন কি নিজের ভেতরেই বিভাজিত অবস্থায়। গায়ত্রী স্পিভ্যাক প্রশ্ন তুললেন, ইতিহাস রচনার প্রতিটি উপাদানই যখন দেখিয়ে দিচ্ছে যে নিম্নবর্গ মানেই 'কোনও এক আদর্শ থেকে বিচ্যুতি', তখন নিম্নবর্গের ঐতিহাসিককে অত ঘটা করে বিশুদ্ধ কৃষকচৈতন্য অথবা একান্তভাবে স্বতন্ত্র নিম্নবর্গের রাজনীতির স্লোগান আওড়াতে

হচ্ছে কেন? বুর্জোয়া ইতিহাস রচনায় 'মানব' অথবা 'নাগরিক' নামে যে সার্বভৌম কর্তাটি অধিষ্ঠিত হয়েছিল, নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক তো দেখিয়েছেন যে সেই কর্তাটির আসল পরিচয় হল সে উচ্চবর্গ। এখন আবার সেই জায়গায় 'নিম্নবর্গ'-কে আর-একটি সার্বভৌম কর্তার পোশাক পরিয়ে ইতিহাসের নায়ক হিসেবে উপস্থিত করার প্রয়োজন কী? আসলে ইতিহাসের কোনও একটি কর্তা আছে, এবং তার একটি বিশুদ্ধ পূর্ণাবয়ব চৈতন্য আছে, এই ধারণাটাকেই তো নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক তাঁর গবেষণার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করেছেন। সেই ধারণাকেই আবার তাঁরা ফেরত আনার চেষ্টা করছেন কেন? ঐতিহাসিকের লেখার ভেতর দিয়ে নিম্নবর্গ তার নিজের কথা বলবে, এটা তো নিতান্তই গল্পকথা। খুব বেশি হলে সেটা ঐতিহাসিকের রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রকাশ। আসলে তো ঐতিহাসিক নিম্নবর্গের প্রতিনিধিত্ব করছেন মাত্র। নিম্নবর্গকে ইতিহাসের পাতায় উপস্থিত করছেন। নিম্নবর্গ তার নিজের কথা কখনওই বলতে পারে না।

১৯৮৫ সালে লেখা প্রবন্ধ দুটিতে গায়ত্রী স্পিভ্যাক প্রস্তাব দিয়েছিলেন, 'সবার ওপরে নিম্নবর্গ সত্য', এরকম মন্ত্র না আউড়ে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের চেষ্টা করা উচিত উচ্চবর্গের অপর হিসেবে নিম্নবর্গকে কীভাবে নির্মাণ করা হয়, সেই প্রক্রিয়াগুলোকে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা। হাজার আওয়াজের ভেতর থেকে নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বর আলাদা করে বের করে আনার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। ইতিহাসের দলিলে যে-কণ্ঠস্বরই শুনি না কেন, তা নিম্নবর্গের কথা নয়, অন্যের নির্মাণ। এই নির্মাণের সামাজিক পদ্ধতিগুলি কী, কোন কোন প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তা তৈরি হয়, কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তা ব্যাপক সামাজিক স্বীকৃতি পায়, সে-সব প্রক্রিয়াগুলো আবিষ্কার করাই নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাঁদের কাছে সেটাই সবচেয়ে বাস্তব প্রত্যাশা।

মোটামুটিভাবে পঞ্চম-ষষ্ঠ খণ্ড থেকে *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এ প্রকাশিত গবেষণায় নতুন ঝোঁক দেখা দিতে শুরু করে। আগের সঙ্গে পরের পর্বের প্রধান তফাত এইখানে যে ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে নিম্নবর্গের সত্তা বা চৈতন্যের একটা বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ চেহারার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব, এই অতি সরল ধারণাটি এখন পরিত্যক্ত হল। নিম্নবর্গের ইতিহাস আংশিক, অসংলগ্ন, অসম্পূর্ণ, তার চেতনাও বহুধাবিভক্ত, ক্ষমতাশীল আর ক্ষমতাহীন নানা শ্রেণীচৈতন্যের বিভিন্ন উপাদানের তা সংমিশ্রণ—এই সিদ্ধান্তগুলিকেও এখন অনেক গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকার করা হল। ফলে বিদ্রোহের মুহূর্তে কৃষকচৈতন্যের স্বকীয়তার পাশাপাশি দৈনন্দিন অধীনতার জীবনযাপনে কৃষকচৈতন্যের স্বরূপ সন্ধান জরুরি হয়ে পড়ল। এবং এই প্রশ্নগুলো এসে পড়তে দেখা গেল, প্রচলিত সমাজবিজ্ঞান ইতিহাসচর্চার প্রায় প্রতিটি বিষয় নিয়েই 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটা নতুন অনুসন্ধানের পথ খুলে যাচ্ছে। কারণ প্রশ্নটা এখন আর এই রইল না যে 'নিম্নবর্গের প্রকৃত স্বরূপ কী?' প্রশ্নটা হয়ে গেল 'নিম্নবর্গকে রিপ্রেসেন্ট করা হয় কীভাবে?' 'রিপ্রেসেন্ট' কথাটা এখানে প্রদর্শন করা আর প্রতিনিধিত্ব করা, উভয় অর্থেই প্রযোজ্য। উচ্চবর্গের অপর হিসেবে নিম্নবর্গের ধারণার নির্মাণ—এই বিষয়টি 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর গোড়া থেকে চর্চিত হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তখন অনুমানটি এমন ছিল যে

Scanned with CamScanner

সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলে উচ্চবর্গের নির্মাণের খোলশটা খসে পড়বে, প্রকৃত নিম্নবর্গের স্বরূপ চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এই অনুমানটি যে ভুল, রিপ্রেসেন্টেশন-এর গণ্ডি অতিক্রম করে কোনও এক প্রত্যক্ষ বাস্তবের উপলব্ধিতে পৌঁছনো যে অসম্ভব, এটা একবার স্বীকার করে নেওয়ার পর খাঁটি আগমার্কা নিম্নবর্গের ইতিহাস লেখার সদিচ্ছাটুকুও আর পোষণ করা সম্ভব ছিল না। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের চোখের সামনে রোমান্টিকতার মোহজাল থেকে থাকলে তা এবার নিশ্চিতভাবে খসে পড়ল।

রিপ্রেসেন্টেশন-এর প্রক্রিয়াগুলোই যেহেতু এখন বিশ্লেষণের লক্ষ্য, তাই গবেষণার পদ্ধতিও অনেকাংশে বদলে গেল। একদিকে শঙ্কাক গিয়ে পড়ল টেক্সট্ বা পাঠবস্তুর খুঁটিনাটি বিশ্লেষণে। ক্ষমতাশীল উচ্চবর্গের দ্বারা নিম্নবর্গের নির্মাণ—এর নিদর্শন আমরা পাই ইতিহাসের দলিলে। হাজার হাজার দলিল, সেই দলিলের ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিকের বর্ণনা, তার পাশাপাশি অন্য নানাবিধ জ্ঞানচর্চা, ধর্মচর্চা, সমাজবিধি, এ-সবের সংমিশ্রণে তৈরি হয় এক-একটি প্রভাবশালী ডিসকোর্স যার মাধ্যমে ক্ষমতাশীল শ্রেণীর মতাদর্শ সামাজিক আধিপত্য বিস্তার করে। এইসব ডিসকোর্সের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন সময়ে নিম্নবর্গকে চিহ্নিত করা হয়েছে বিভিন্নভাবে। 'নিম্নবর্গের নির্মাণ' এই প্রশ্নটিকে সামনে রাখার ফলে এবার ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা এবং আধুনিক সমাজ-প্রতিষ্ঠান গড়ার জটিল ইতিহাসের দলিল সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে পড়ার প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের প্রসার, ইংরেজি শিক্ষা, তথাকথিত নবজাগরণ, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ—এইসব বহুচর্চিত বিষয় নিয়েও *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এ নতুন করে আলোচনা শুরু হল।[৫] সেই সঙ্গে নজর গিয়ে পড়ল আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর, যার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানবিজ্ঞান-সঞ্চারিত মতাদর্শ এবং আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র ঔপনিবেশিক এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতবর্ষে তার জাল বিস্তার করেছে। অর্থাৎ, স্কুল-কলেজ, সংবাদপত্র, প্রকাশনসংস্থা, হাসপাতাল-ডাক্তার-চিকিৎসাব্যবস্থা, জনসংখ্যাগণনা, রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স, আধুনিক শিল্পউৎপাদনে দৈনন্দিন শ্রমসংগঠন, বিজ্ঞান-সংস্থা, গবেষণাগার—এইসব প্রতিষ্ঠানের বিশদ ইতিহাসও এবার 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর বিষয় হয়ে পড়ল।[৬]

এই দিক পরিবর্তনে সব পাঠক সন্তুষ্ট হননি। নিম্নবর্গকে নায়ক হিসেবে দাঁড় করিয়ে এক ধরনের সাদাসাপটা ঐতিহাসিক রোমান্সের বদলে পাঠকের সামনে এবার এসে পড়ল সরকারি দলিল, ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক, জাতীয়তাবাদী নেতার বক্তৃতা, সমাজবিজ্ঞানের প্রবন্ধের খুঁটিনাটি চুলচেরা বিশ্লেষণ। অনেকেই বললেন, নিম্নবর্গের ইতিহাস এবার ভদ্রলোকের ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে। আলোচনার লক্ষ্যবস্তু নিম্নবর্গের ক্রিয়াকলাপ থেকে ছড়িয়ে সমাজ-রাষ্ট্রের অন্য সব এলাকাতে পৌঁছে যাওয়ায় একটা অসুবিধা অবশ্য হচ্ছিল। সমাজবিজ্ঞান চর্চার জগতে প্রথম আলোড়নটা কেটে যাওয়ার পর 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর জন্য একটা প্রাতিষ্ঠানিক জায়গা যেন নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়াতে গিয়ে ঔপনিবেশিক,

জাতীয়তাবাদী, মার্কসবাদী ইতিহাসে রচনার পাশাপাশি 'সাবলটার্ন স্কুল' নিয়ে খানিকটা পড়িয়ে দেওয়া শুরু হয়েছিল। এখন দেখা গেল, 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর কোনও নির্দিষ্ট বিষয়গত সীমারেখা থাকছে না, সব বিষয় নিয়েই সেখানে লেখাজোকা শুরু হয়ে গিয়েছে। আপত্তিটা অনেকটা এরকম হয়ে দাঁড়াল—'বেশ তো তোমরা চাষাভুষো কুলিকামিন নিয়ে লিখছিলে। এখন হঠাৎ বঙ্কিম-গান্ধী-জওহরলাল বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য নিয়ে লিখতে শুরু করলে কেন?' এই আপত্তি এখনো শুনতে পাই।

আসলে 'নিম্নবর্গের নির্মাণ', এই পদ্ধতিগত আবিষ্কারটির পর নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের কাজ আর কেবল নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র ক্রিয়াকলাপের বিবরণ দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সমগ্র সমাজ-প্রতিষ্ঠান-ভাবাদর্শের জগতকেই এখন নিম্নবর্গের ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আবিষ্কারটি একান্তই পদ্ধতিগত। যে-কোনও প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বা রাজনৈতিক কর্মসূচী এবং ক্রিয়াকলাপ যা প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাতন্ত্রের অঙ্গ বা তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তার বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা করার সরঞ্জাম এই পদ্ধতি থেকে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কোনও বিকল্প রাষ্ট্রক্ষমতা নির্মাণের কর্মসূচি তা থেকে পাওয়া যাবে না। বরং যে কোনও প্রতিষ্ঠিত অথবা প্রতিষ্ঠার অভিলাষী ক্ষমতাতন্ত্রের সমালোচনাই 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর ভেতর সম্ভব।

তার মানে কিন্তু এই নয় যে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর লেখক বা পাঠক হিসেবে সমসাময়িক রাজনৈতিক বাদানুবাদে যোগ দেওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, উচ্চবর্গের রাজনীতি বা মতাদর্শের ভেতর নিম্নবর্গের প্রতিকল্পটি কীভাবে নির্মিত হয়েছে, সেই বিষয়টি এখন অনেক স্পষ্টভাবে নজরে আসার ফলে উচ্চবর্গীয় রাজনীতির বিবাদে ভিন্নতর অবস্থান নেওয়াও অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। সাম্প্রতিক পর্যায়ের 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর আলোচনায় অন্তত তিনটি সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছে বলে আমি মনে করি। তিনটি ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠীদের পারস্পরিক বিতর্কে নিম্নবর্গীয় রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন মাত্রা যোগ করা গিয়েছে।[৭]

প্রথম বিষয়টি হল সাম্প্রদায়িকতা। এই নিয়ে অধিকাংশ আলোচনাই দুটি বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে হয়েছে—একটি হিন্দুত্ববাদী, অন্যটি সেকুলারপন্থী। 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর আলোচনা থেকে যে-দিকটা অনেক স্পষ্ট হয়েছে, সেটা হল যে এই সেকুলার কমিউনাল ঝগড়া কোনও অর্থেই আধুনিকতা বনাম পশ্চাৎপদতার ঝগড়া নয়। দুটিই সমানভাবে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অঙ্গীভূত। দ্বিতীয়ত, দুই পক্ষ আসলে আধুনিক রাষ্ট্রক্ষমতা বিস্তারের দুধরনের কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টা করে চলেছে। দুটিই উচ্চবর্গীয়, কিন্তু তাতে নিম্নবর্গের নির্মাণ দুরকমের। তৃতীয়ত, নিম্নবর্গেরাও এই দুধরনের আধিপত্যের সামনে পড়ে নিজেদের মতো, কিন্তু বিভিন্নভাবে, তার মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে। দরিদ্র এবং শোষিত হলেই তারা সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরোধী এবং সেকুলার রাজনীতির সমর্থক হবে, এই অতিসরল সিদ্ধান্ত নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক প্রথমেই খারিজ করে দেবেন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি নিয়ে সাম্প্রতিক 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এ উল্লেখযোগ্য আলোচনা

Scanned with CamScanner

হয়েছে, তা হল জাতিভেদ প্রথা। বিশেষ করে মণ্ডল কমিশন বিরোধী আন্দোলনের পর এই নিয়ে তুমুল হট্টগোল হয়ে গেছে। ডিসকোর্স হিসেবে দেখার ফলে জাতপাত নিয়ে সাম্প্রতিক রাজনীতির একটি দিক কিন্তু অনেক স্পষ্ট হয়েছে। তা হল যে জাতিভেদ প্রথার ধর্মীয় ভিত্তি এখন প্রায় সম্পূর্ণ লুপ্ত। কেউ তা নিয়ে আর কথা বলে না। এখন সমস্ত বিরোধেরই কেন্দ্র হল আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবস্থান নিয়ে। দ্বিতীয়ত, তথাকথিত সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিগত পরিচয় গণ্য করা বা না করার মধ্যেও আবার উচ্চবর্গের আধিপত্য বিস্তারের দুধরনের কৌশল কাজ করছে। এবং নিম্নবর্গও তার সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্নভাবে এই ক্ষমতাতন্ত্রের বিরোধিতাও করছে, আবার সুযোগও নিচ্ছে।

তৃতীয় বিষয়টি হল মহিলাদের সামাজিক অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনা। পুরুষশাসিত সমাজে সব নারীই এক অর্থে নিম্নবর্গ। কিন্তু তাই বলে নারীর কোনও শ্রেণীগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত পরিচয় নেই, এও সত্য নয়। সুতরাং নিম্নবর্গের নির্মাণ দেখতে হলে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অধীনতাও যেমন বিশ্লেষণের বিষয়, তেমনি অন্যান্য ক্ষমতার সম্পর্ক, যেমন শ্রেণী, জাতি, সম্প্রদায়, ইত্যাদি কীভাবে সেই নিম্নবর্গীয় নারীর নির্মাণটিকে আরও জটিল করে তোলে, তাও বিশেষ গবেষণার বিষয়। সাম্প্রতিক বিতর্কে সমাজসংস্কার এবং বিশেষ করে নারীর অধিকার রক্ষার জন্য আইনের সংস্কার নিয়ে প্রচুর আলোচনা চলেছে। কিন্তু সামগ্রিক অর্থে নারীর অধীনতা আর বিশেষ অর্থে নিম্নবর্গীয় নারীর অধীনতা পরস্পর সম্পর্কিত হলেও যে দুটি ভিন্ন বিষয়, এই সত্যটি তুলে ধরার ফলে সাম্প্রতিক কালে ভারতের নারীবাদী রাজনীতির বিতর্কে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

এই তিনটি ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গের রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী এবং প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী রাজনীতির সমালোচনা তৈরি হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সিংহভাগ ধরে যে উচ্চবর্গীয় রাজনীতি ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, আগামীদিনে তার বিরোধী শক্তি হয়তো এইসব সমালোচনাকে অবলম্বন করেই সংগঠিত হবে। বামপন্থী ভাবনাচিন্তার জগতে অন্যদের তুলনায় 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' যে সেই সম্ভাবনাকে অপেক্ষাকৃত বেশি তাত্ত্বিক স্বীকৃতি দিতে পেরেছে, তার প্রধান কারণ হয়তো এই যে, পদ্ধতির দিক দিয়ে অত্যন্ত মৌলিক সমালোচনা এবং দিকপরিবর্তনও এখানে নিষিদ্ধ হয়নি। নিম্নবর্গের ইতিহাস যেমন অসম্পূর্ণ, পরিবর্তনশীল, নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চারও ঠিক তেমনই অবদ্ধ আর সচল থাকার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই অর্থে এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই ইতিহাসচর্চায় নিম্নবর্গের সংগ্রামের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার প্রয়াস চলেছে।

টীকা

১ বর্তমান সংকলনে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হল। দ্র. পৃ. ২২।

২ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'পরিভাষা পরিচয়: সাবলটার্ন', *এক্ষণ*, গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৩৯১ (১৯৮৪-৮৫)।

৩ এই পর্যায়ের বহু প্রবন্ধের মধ্যে থেকে তিনটি প্রবন্ধ বর্তমান সংকলনে দেওয়া হল—রণজিৎ গুহ-র 'একটি অসুরের কাহিনী', শাহিদ আমিন-এর 'গান্ধী যখন মহাত্মা' আর ডেভিড হার্ডিমান-এর 'দেবীর আবির্ভাব'।

৪ Gayatri Chakravorty Spivak, 'Subaltern Studies: Deconstructing Historiography' in Ranajit Guha, ed., *Subaltern Studies* IV (Delhi: Oxford University Press, 1985), pp. 338-63; 'Can the Subaltern Speak?' in Cary Nelson and Lawrence Grossberg, eds., *Marxism and the Interpretation of Culture* (Urban: University of Illinois Press 1988).

৫ এই পর্যায়ের রচনার নিদর্শন এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত: দ্র. পার্থ চট্টোপাধ্যায়-এর প্রবন্ধ 'ইতিহাসের উত্তরাধিকার'।

৬ এর দৃষ্টান্ত এই সংকলনে দীপেশ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ।

৭ তিনটি দৃষ্টান্ত এই সংকলনে দেওয়া হল: গৌতম ভদ্র, বীণা দাস ও জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে-র প্রবন্ধ।

Scanned with CamScanner